ভাষাচিন্তক রবীন্দ্রনাথ

সংকলন ও সম্পাদনা
অলিভা দাক্ষী

পুনশ্চ

সূচি

ভূমিকা ৯

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাবিজ্ঞান: ৩১

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্	বাঙ্গালা ভাষা-তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ / ৩৩
কাজী দীন মুহম্মদ	ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ / ৩৫
মুহম্মদ আবদুল হাই	ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ / ৪৮
পবিত্র সরকার	রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব / ৬৬
সিরাজুদ্দীন আমেদ	রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসায় ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা / ৮৬
মিলনকান্তি বিশ্বাস	রবীন্দ্রনাথের ভাষাতত্ত্বচিন্তা / ৯৯
অলিভা দাক্ষী	বাংলা ভাষাবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ / ১১৩

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা: ১২৫

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ / ১২৭
মঞ্জুলী ঘোষ	রবীন্দ্রনাথ : ভাষাপ্রসঙ্গে / ১৩৭
কৃষ্ণা দাশ	রবীন্দ্রনাথের ভাষাদর্শন / ১৪৩
সুনীল সেনগুপ্ত	রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা ও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান / ১৫৯
মনসুর মুসা	রবীন্দ্রনাথের ভাষা-চিন্তা / ১৭০
অলিভা দাক্ষী	রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ভাবনায় 'শব্দতত্ত্ব' / ১৭৯
সুকুমার বিশ্বাস	রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা (বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা) / ১৮৬

রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-ভাবনা : ২০১

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ / ২০৩
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের উপসর্গপ্রীতি / ২০৭
পবিত্র সরকার রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ : চিন্তা ও চর্চা / ২২২
নরেন বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-ভাবনা / ২৩২
মনসুর মুসা রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণের ধারণা / ২৩৯
অলিভা দাক্ষী রবীন্দ্র-ভাবনায় বাংলা ব্যাকরণ / ২৪৩
কৃষ্ণা ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের বাংলা অন্বয়শৈলীচিন্তা : সহজপাঠের পদক্রম / ২৫৩

রবীন্দ্র-ভাবনায় বাংলা বানান : ২৬১

রবীন্দ্রনাথ-দেবপ্রসাদ ঘোষ পত্রালোচনা: বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান / ২৬৩
পবিত্র সরকার বাংলা বানান ও রবীন্দ্রনাথ / ৩১১
অমল পাল রবীন্দ্রনাথের বানানভাবনা / ৩১৭

রবীন্দ্র-ভাবনায় পরিভাষা ও মাতৃভাষা প্রসঙ্গ : ৩২১

পবিত্র সরকার পরিভাষা-প্রসঙ্গ : রবীন্দ্র-পরিভাষা / ৩২৩
উদয়নারায়ণ সিংহ মাতৃভাষা ও রবীন্দ্রনাথ / ৩৩৩

ইংরেজি প্রবন্ধ : ৩৪১

E. M. Bykova Tagore : The Linguist
[Translated by Natalia Vaselova] / ৩৪৩
Pabitra Sarkar Rabindranath Tagore : The Linguist / ৩৬১

নির্ঘণ্ট ৩৭৭
লেখক পরিচিতি ৩৮৫

ভূমিকা

'ভাষাতত্ত্ব' ও 'ভাষাবিজ্ঞান' শব্দ দুটি সমার্থক নয়। প্রথমটি প্রাচীন, দ্বিতীয়টি অর্বাচীন। 'ভাষাতত্ত্ব' বিষয়টির ধারণা জন্ম নেয় ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে সার উইলিয়ম্ জোন্স-এর রয়্যাল্ এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠার অধিবেশনের বক্তৃতা থেকে। তিনি গ্রিক, ল্যাটিন, প্রাচীন পারসিক ভাষার শব্দের সঙ্গে সংস্কৃতের পারস্পরিক তুলনার সূত্র ধরে প্রমাণ করেন উক্ত ভাষাগুলি পরস্পর সম্পর্কিত। পরবর্তীকালে জার্মানীতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Comparative Philology) সূত্রপাত করেন ফ্রিদ্রিশ্ ফন্ শ্লেগেল (১৭৭২ - ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ)। তিনিই প্রথম জার্মান ভাষায় 'Vergleichende Grammatik' কথাটি ব্যবহার করেন। শ্লেগেল আরও জানান, উক্ত ভাষাগুলির সঙ্গে শুধু সংস্কৃত নয়, জার্মান ভাষারও ধ্বনিগত ধারাবাহিক পারম্পর্য আছে এবং এই সূত্রের ভিত্তিতে ভাষাগুলির বংশগত ঐক্য প্রতিপন্ন করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব যা ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত এবং আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যমণি। তিনি একদিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রাজ্ঞ মনীষী, অন্যদিকে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের 'জনক' এবং 'পথিকৃৎ'। বিংশ শতকের গোড়ায় যখন ফের্দিনো দ্য সোস্যুর-এর হাতে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সৃষ্টির আলো দেখল, তার অনেক আগেই ১৮৮৫ - ১৯০৫ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় বাংলাভাষার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই তাঁকে 'ভাষাবিজ্ঞানী' উপাধিতে ভূষিত করতে কারোর কোনো সংশয় নেই। তাঁর সৃজনশীল কর্মসাধনা আজও ভাষাবিজ্ঞানীর চোখে বিস্ময়। রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। তাঁর দুটি গ্রন্থ 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (= 'শব্দতত্ত্ব') ও 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ভাবীকালের প্রজন্মের কাছে প্রেরণা ও প্রাণশক্তির স্ফুরণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষা-ভাবনা সাধারণ জনগণের মননে ও চেতনায় পৌঁছে দেবার উদ্দেশে এই প্রয়াস। বর্তমানে 'ভাষাবিজ্ঞান' ভারত ও বাংলাদেশ — উপমহাদেশের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর পঠন-পাঠনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাবিজ্ঞানসম্মত চিন্তা, ব্যাকরণ-ভাবনা, বানান-ভাবনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সমগ্র বাঙালি পাঠকসমাজের কাছে কতখানি জরুরি তা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

বেদের ভাষায় যিনি 'বিশ্বমনাঃ', রবীন্দ্রনাথ সেই প্রতিভায় ভূষিত — কবি রবীন্দ্রনাথ, সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এবং সবশেষে একজন তীক্ষ্ণধী ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ। ভাষা ও সাহিত্যের শিল্পসাধনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসায় আবিষ্ট রবীন্দ্র-মানস এক বিরল মহিমান্বিত প্রতিভায়

ভাস্বর। বিজ্ঞানমনস্বী রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বাংলাভাষাকে বিশ্লেষণ যেমন করেছেন তেমনি অন্যান্য ভাষার দৃষ্টান্তে বাংলাভাষার সংশ্লেষণধর্মী রূপটিও তুলে ধরেছেন। জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় বাংলাভাষার মাধুর্যের পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন বলেই বাংলাভাষার নিগূঢ় তত্ত্ব সহজ ও রসপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাবধারায় আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। বিশ্বের দরবারে বাংলাভাষার মান উন্নীত করার স্থপতি রবীন্দ্রনাথ বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর গর্ব ও অহংকার।

শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্র-মানসে যে বিজ্ঞানচেতনা উদ্দীপিত হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি পিতার সঙ্গে ডালহৌসি ভ্রমণকালে গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের পরিচয় থেকে। ''নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন'' (বিশ্বপরিচয়)। বিজ্ঞানের স্বাদ পেয়েছিলেন শৈশবকালেই। জানার কৌতূহল তাঁর থেমে থাকেনি। কৈশোর-যৌবনে পৌঁছে তা আরও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ১৮৮৫-১৮৮৭ সাল, কবি-মানস 'কড়ি ও কোমল' রচনায় নিবেদিত। তিনি 'জীবনস্মৃতি'-তে স্বীকার করলেন — ''শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে''। কবি-মানসে সাহিত্য-সৃষ্টির ভাবুকতায় ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য। 'কড়ি ও কোমল'-এ 'পুরাতন' কবিতায় 'আজি বসন্তের বায় / একেকটি করে হায় / **উড়ায়ে ফেলিছে** প্রতিদিন // স্মরণ করায় বৈষ্ণব পদাবলীর পংক্তি 'থাকিহ তরুর ছায় / মিনতি **করিছে** মায়/রবি যেন না **লাগায়ে** গায় //। মানুষের মন সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ধ্বনি, শব্দ আর রূপের ভেতর দিয়েই সাহিত্য ও শিল্পের সাধনা করে আসছে। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে উদ্‌ঘাটিত হল ভাষারহস্যের বিশেষ করে বাংলাভাষার ধ্বনিবিজ্ঞানের কয়েকটি গভীর তাত্ত্বিক সূত্র। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম উন্মোচিত হল কবির চোখে ভাষাবিজ্ঞানের ধ্বনিরহস্য। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রাবস্থায় ডা: স্কটের কন্যাকে বাংলা পড়াতে গিয়ে বাংলাভাষার বানান ও উচ্চারণের মধ্যে ধ্বনি-সংঘাত তাঁর চেতনায় প্রথম ধরা পড়ল খুব আকস্মিক ভাবেই। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাতঃকালে বাংলাভাষার অন্তর্লোকের অলিতে গলিতে অনুসন্ধানের গভীর টান অনুভব করলেন কবি। অন্তর্দৃষ্টির আলোয় অবগাহন করে মাত্র সতেরো বছরের তরুণের হাতে-খড়ি হল বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের জগতে। শুরু হল মনের গভীরে অনুসন্ধিৎসার অন্তঃপ্রবাহ। ভাষার অন্দরমহলের দিকে যখন তাকালেন তখন একেবারে তীক্ষ্ণ ও গভীর বিশ্লেষণের মধ্যে ধ্বনির ধর্ম বিচারে মগ্ন হয়ে পড়লেন। ''বাংলা বানানও বাঁধন মানে না, তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে অভ্যাসবশত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তখন নিয়ম ব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম''। সেই যে শুরু হল তা স্থায়ী হল দীর্ঘ কুড়ি বছর ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কীভাবে যে চব্বিশ বছরের কবি যুবক রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা এককালিক সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের (descriptive structural linguistics) গোড়াপত্তন ঘটল তা কবি নিজেও জ্ঞাত ছিলেন না বোধ হয়।

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই চলছিল ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যা ও তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের চর্চা। তারই সঙ্গে অব্যাহত ছিল বঙ্গদেশে সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারায় বাংলা ব্যাকরণ রচনার অপ্রতিহত গতি। রবীন্দ্রনাথ সেই যুগে দাঁড়িয়ে একদিকে আবেগের উপকরণ দিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে চলেছেন। ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে 'মানসী'র যুগ (১৮৮৮ - ১৮৯০), 'সাধনা'র যুগ (১৮৯২), 'ভারতী'র যুগ (১৮৯৮ - ১৯০১), ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ছাত্রদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক রচনা, 'ইংরাজি সোপান' রচনা ইত্যাদি ..., অন্যদিকে তাঁর ভাষা-জিজ্ঞাসু মন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ও বাংলা ব্যাকরণের রস আস্বাদন করছিল সমান তালে। তাঁর লেখায় উঠে আসতে দেখি একদিকে বীম্‌স্, হর্নলে, গ্রিয়ার্সন, কেলগ্, ম্যাক্সমূলার সাহেবের উল্লেখ ও তাঁদের রচনার সার-বস্তু, অন্যদিকে সংস্কৃত ভাবধারায় আচ্ছন্ন বাংলা ব্যাকরণের শৃঙ্খল মোচনের সুগভীর আকুতি ও প্রয়াস। শুধু বাংলা সাহিত্য রচনায় বিভোর ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, বাংলাভাষার অন্দরমহলের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য তাঁকে ভাবিত করেছিল। তাঁর মুখে শুনি — "বীম্‌স্ সাহেব, হ্যর্নলে সাহেব, হিন্দি ব্যাকরণকার কেলগ্ সাহেব, মৈথিলী ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়র্সন সাহেব বিদেশী হইয়া ভারতবর্ষ-প্রচলিত আর্যভাষার পথলুপ্ত অপরিচিত জটিল মহারণ্যতলে প্রবেশপূর্বক অশ্রান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিভার বলে যে-সকল প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা লাভ করিয়া ... আমাদের ... লজ্জা ও বিনতি অনুভব করা উচিত।"

১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের বাইশটি প্রবন্ধ 'বালক', 'সাধনা', 'ভারতী', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', 'বঙ্গদর্শন' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ১৯০৯ সালে 'শব্দতত্ত্ব'-এ সামগ্রিকরূপে আত্মপ্রকাশ করল। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে বহুভাষাজ্ঞানী পণ্ডিতপ্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রীর করকমলে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে আরও কিছু প্রবন্ধ সংযোজিত হয়ে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের লেখাগুলি ছিল বাংলার বিশেষত রবীন্দ্র-মতে 'প্রাকৃত বাংলা'-র বিশ্লেষণধর্মী রচনা। আধুনিক এককালিক সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের জন্মের আগেই কবির চোখ দিয়েই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের চক্ষুষ্মান হল—ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে যা 'বিস্ময়ের বিস্ময়'। ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের মুখে শুনি—"গবেষণা করছেন কবি, তাঁর দ্বারা ' পরিচালিত' হচ্ছেন পণ্ডিতেরা।" 'শব্দতত্ত্ব' আলোচনায় প্রাকৃত চল্‌তি বাংলার স্বভাব ও স্বরূপটি যে-ভাবে বিন্যস্ত ও বিশ্লেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, আগে কেউ বাংলাভাষার খবর তাঁর মতো করে রাখেননি। গভীর পর্যবেক্ষণশক্তি, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও প্রখর চিন্তাশক্তির পরিচয় বহন করে আজও আমাদের কাছে 'শব্দতত্ত্ব'-এর আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

'শব্দতত্ত্ব'-এর গোড়ায় আমরা দেখে নেব বাংলা ধ্বনির উচ্চারণতত্ত্ব নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ। 'বাংলা উচ্চারণ' ('বালক' পত্রিকা, ১৮৮৫), 'স্বরবর্ণ অ' ('সাধনা' পত্রিকা, ১৮৯২) এবং 'স্বরবর্ণ এ' ('সাধনা' পত্রিকা ১৮৯২)তিনটি প্রবন্ধে প্রথম ধরা পড়ে বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য কবি রবীন্দ্রনাথের ওজস্বিতার গুণে। 'স্বরবর্ণ অ' ও 'স্বরবর্ণ এ' রচনাকালে তিনি 'সোনার তরী'-র কবিতা সৃষ্টির আনন্দে মত্ত। তারই পাশাপাশি সাধনা যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির ফসল ছোটগল্প। 'হিতবাদী'-তে (১৮৯১) ছোটগল্পের যে নতুন ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছিলেন 'সাধনা'-র টানে তা আবার ফিরে এল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা ও দুঃখের ইতিহাস, বিক্ষোভের

আন্দোলন ছোটগল্পে সংকীর্ণ পরিসরে মাধুর্য ও ভাবগাম্ভীর্যে সঞ্চারিত। তারই ফাঁকে ভাষার চুন, বালি, সুরকি, ইট নিয়ে গাঁথনির কারবার চলছিল পুরোদমে। বাংলা অ-ধ্বনি "সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়।" 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ-সংকীর্ণতা এবং বিশেষ বিশেষ ধ্বনি সংসর্গে 'ও' ধ্বনিতে রূপান্তরণের প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় 'স্বরসঙ্গতি' বা 'স্বরধ্বনির উচ্চতা-সাম্যে'র লক্ষণ সূচিত করে। বাংলা 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাপ্ত নয় বলেই অনুমান (পরে উল্লিখিত)। সেই সূত্রেই অ ধ্বনির উচ্চারণ এত বিকারগ্রস্ত ও বৈচিত্র্যময়। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে অ-ধ্বনি ছাড়া লক্ষ করেন—"কেবল তিনটে স , দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে"। তিনটি স (শ, ষ, স) বর্ণমালার উচ্চারণে কোনো তফাত নেই। তা সর্বত্রই 'শ' ধ্বনির মতো, কিন্তু যুক্তাক্ষরে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের সচেতন করে তোলেন যে-সময়, ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণারই জন্ম হয় নি। সাংগঠনিক ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় (phonetics & phonemics) 'শ' ধ্বনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধ্বনিমূল (phoneme) এবং অন্য শিস্ ধ্বনিগুলি পূরকধ্বনি অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ধ্বনি-পরিবেশে ও শব্দের অবস্থানে শর্তসাপেক্ষে উচ্চারিত হয়। এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। একি ভাবা যায়? এক অভাবনীয় অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর। তিনি 'বাংলা উচ্চারণ' ও 'স্বরবর্ণ অ' প্রবন্ধদ্বয়ে আটটি নিয়মের উল্লেখ করেন। সব কটি নিয়মই মূল্যবান তথ্যের অবতারণা করে। 'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধে আমরা জানতে পারি এ স্বরবর্ণের অন্য একটি চেহারা 'অ্যা' — নানা ধ্বনি-পরিবেশে বিকৃত সত্তার আকার ধারণ করে। সেই বার্তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আমাদের স্মরণ করান। 'টা টো টে' ('সাধনা' পত্রিকা, ১৮৯২) প্রবন্ধে আমরা স্বরসঙ্গতির ইঙ্গিত পাই। শুধু তাই নয়, 'টা' নির্দেশক প্রত্যয়, তার চেহারায় ধ্বনিমূলীয় বদল ঘটে হয় 'টো', 'টে' বিশেষ ধ্বনি-পরিবেশে। ধ্বনিবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'morphophonemic change'। এই সূত্রটিও রবীন্দ্র-ভাবনাপ্রসূত।

'শব্দতত্ত্ব'-এ রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ব্যাকরণের বেশ কয়েকটি দিকে আলোকপাত করেন। 'বাংলা বহুবচন' ('ভারতী' পত্রিকা, ১৮৯৮)-এ রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রেণিবাচক শব্দযোগে বহুবচন প্রাচীন কাব্যে যেমন, আমাসব, তোমাসব, ছেলেরা সব, মেয়েরা সকল, তুলনায়, মৈথিলি 'নেনাসভ'। শুধু বাংলা নয়, রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে তুলনা করেছেন অতি নিপুণ মনস্বিতায়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে হিন্দি, নেপালি, মৈথিলি, অসমীয়া, ওড়িআর সঙ্গে বাংলার বহুবচনের তুলনা করেন। ১৮৯৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে জন বীম্‌সের প্রকাশিত গ্রন্থের 'Grammar of the Bengali Language, Literary and Colloquial' (pages only 68; 1891) বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক রচনা-বিষয়ে সমালোচনার সুর থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মুখে সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ইঙ্গিত পাই। 'বাংলা ব্যাকরণ' ('বঙ্গদর্শন', ১৯০১) প্রবন্ধে আগাগোড়া আমরা তাঁর মুখ থেকে বেদনার সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে শুনি। "বাংলা ভাষা বাংলাব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে।" দেখা যায়, বাংলা ব্যাকরণ যা রবীন্দ্র-যুগে রচিত হয়েছিল সেগুলির বেশির ভাগ সংস্কৃত ভাষার নিয়মে গড়া। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন

'ছাঁচ' সেইটিই আসলে সেই ভাষার ব্যাকরণ। ''ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ।'' 'কারক' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রদানকারককে বাংলা ব্যাকরণে ঠাঁই দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদানকারককে জবরদস্তি করে রাখা হয়েছে, যার অস্তিত্ব কর্মকারকের মধ্যে লুপ্ত। বিষয়টি আজও বিতর্কিত। 'ভাষার ইঙ্গিত' ('ভারতী' পত্রিকা, ১৯০৪) প্রবন্ধে বাংলাভাষার স্বকীয় সত্তার অন্তর্নিহিত গূঢ় নির্যাস যা অনির্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করে এমন অনুভূতিগ্রাহ্য অর্থহীন কল্পনাপ্রসূত শব্দ রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় 'বোবার ভাষা', 'ইহা ইঙ্গিত'। এগুলি আর কিছু নয়, অনুকরণমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৯০০) ও 'বাংলা শব্দদ্বৈত' (ঐ) নামক প্রবন্ধদ্বয়ে উল্লেখ করেন এই বলে যে, এগুলি বাংলার নিজস্ব সম্পদ। শব্দজোড়ের পশ্চাৎ শব্দকে তিনি 'দোসর' শব্দ নামে অভিহিত করেন। শব্দজোড়ে অনেক সময় মূল শব্দে অথবা দোসর শব্দে আ-কার বা ও-কার যোগে শব্দটি দ্বিগুণিত হয়ে পড়ে এবং অন্যরকম অর্থব্যঞ্জনার সংযুক্তীকরণ ঘটে। ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বাংলা বহুবচন' ('ভারতী', জ্যৈষ্ঠ ১৮৯৮), 'সম্বন্ধে কার' (ঐ শ্রাবণ), 'বঙ্গভাষা' (ঐ বৈশাখ), 'ভাষাবিচ্ছেদ' (ঐ শ্রাবণ), 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' (ঐ, পৌষ), 'উপসর্গ-সমালোচনা' (ঐ, বৈশাখ ১৮৯৯), 'বাংলা শব্দদ্বৈত' ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ১ম সংখ্যা, ১৯০০), 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' (ঐ, ৪র্থ সংখ্যা), 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (ঐ, ৩য় সংখ্যা ১৯০১), 'বাংলা ব্যাকরণ' ('বঙ্গদর্শন' ১৯০১)। দশটি প্রবন্ধ যখন রচনা করছিলেন তখন কবিচিত্তে আচ্ছন্ন হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ ও প্রেরণা। সেটি ছিল 'নৈবেদ্য' রচনার যুগ। রবীন্দ্রনাথ যখন 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্য 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছেন এবং 'অচলায়তন' নাটক রচনায় ব্যস্ত তখন তাঁর ভাষা-ভাবনার প্রবন্ধ একটার পর একটা প্রকাশিত হয়ে চলেছে যেমন, 'বাংলা ব্যাকরণের তির্যক রূপ' ('প্রবাসী', আষাঢ়, ১৯১১), 'বাংলা ব্যাকরণের বিশেষ বিশেষ্য' (ঐ, ভাদ্র), 'বাংলা নির্দেশক' (ঐ, আশ্বিন), 'বাংলা বহুবচন' (ঐ, কার্তিক), 'স্ত্রীলিঙ্গ' (ঐ, অগ্রহায়ণ)। তাঁর চিত্ত বহুমুখী অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে থাকত এবং তারই সঙ্গে বহির্জগতের রূপ ও রস সংগ্রহ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনা করতেন বৈজ্ঞানিক চিন্তনশক্তিতে বুঁদ হয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'বাংলাভাষা-পরিচয়' নামে যে গ্রন্থটি আমাদের হাতে আসে সেই গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র-মানসের পরিণত ভাষা-ভাবনার একটি সামগ্রিক রূপরেখা মাতৃভাষার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও আবেগের সুরে আমাদের হৃদয়বোধের গভীরে ধ্বনিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। এই গ্রন্থে বাংলাভাষার আভ্যন্তর রূপের আত্মপ্রকাশ ঘটে অন্য মাত্রায়। তিনি জানান, বাংলাভাষাকে ভালো করে জানতে হবে ''কোথায় তার শক্তি কোথায় তার দুর্বলতা।'' তিনি অতি সহজ, সরল ও সরস ভাষায় আমাদের মর্মে পৌঁছে দেবার উদ্দেশে লিখলেন বাংলাভাষার নানা রহস্য-কথা। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, ''ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল।'' অত্যন্ত কৌতুকের সুরে সরস ভঙ্গিমায় ভাবনার খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা আমরা খুঁজে পাই 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের

শখ মেটাতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার উদ্ভব ইতিহাসের মাটি খুঁড়ে আমাদের জানালেন বাংলার আদিরূপ 'গৌড়ী প্রাকৃত'। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই মতের পক্ষে সায় দেন। 'শব্দতত্ত্ব'-এ সংকলিত প্রবন্ধগুলি নির্মিত হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে, গরজের আবেদনে। সেই একই কথা বাণী হয়ে ফিরে এল সৃষ্টির আনন্দে, খুশির জোয়ারে, রস-মাধুর্যে পূর্ণ মেজাজে 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে'র অঙ্গনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—''বাংলাভাষা-পরিচয় তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে''। তিনি এই গ্রন্থের গোড়াতেই বাংলা বাক্যাধিপের দুই রানীর কথা শোনান—এক, সুয়োরানী ''আদর করে যাকে নাম দেওয়া হয়েছে সাধুভাষা'' ও দুই, দুয়োরানী কথ্য ভাষা, কারোর মতে চলিত ভাষা, রবীন্দ্র-মতে 'প্রাকৃত' বাংলা। তাঁর বিশ্বাস 'সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর দুয়োরানী একলা বসবেন রাজাসনে'। ১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রে' সুবিন্যস্ত পদ্ধতিতে বাংলা কথ্যশৈলীর উত্তরণ ঘটল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস, একটি 'চতুরঙ্গ' সাধুভাষায় ও অন্যটি 'ঘরে-বাইরে' প্রাকৃত বাংলায়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চলতি ভাষায় লেখা গল্প 'পয়লা নম্বর'। প্রাকৃত বাংলা বা চলতি বাংলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা, দুর্বলতারও পরিচয় পাই কারণ চলতি বাংলা ''চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না''। সে শক্তিময়ী চির চলমান।

''শব্দতত্ত্ব'-এ যদিও আলোচিত তথাপি রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণতত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত। ''বাংলা বর্ণমালার অ সংস্কৃত স্বরবর্ণের কোঠায় নেই''। তাই সহজেই প্রশ্ন জাগে বাংলায় 'অ' ধ্বনির আবির্ভাব কোন্ সূত্র ধরে? পূর্বী প্রাচ্য আর্যভাষাগুলির মধ্যে বিশেষত বাংলা, ওড়িআ ও অসমীয়া ভাষায় অ [= ɔ] ধ্বনির উচ্চারণ লক্ষ করা যায় যেমন, ইংরেজি 'call', 'ball', 'fall' ইত্যাদি; মৈথিলি বা হিন্দিতে এই ধ্বনির উচ্চারণ ɔ [schwa] ধ্বনির মতো; যেমন ইংরেজি admit [= ɔdmit], attempt [= ɔtempt] ইত্যাদি। সংস্কৃত আ স্বরের হ্রস্বরূপ সংস্কৃত বা হিন্দির অ [= ɔ]। সুহৃদকুমার ভৌমিক তাঁর 'বাঙলা ভাষার গঠন' গ্রন্থে বাংলা ভাষা-গঠনে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনায় উল্লেখ করেন—''বাঙলা ও সাঁওতালির স্বরধ্বনির সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে বলা যায়, বিশুদ্ধ অ (যেমন ঘর) এবং অ্যা (দেখা, খেলা) এ দুটি ধ্বনি বাঙলা ও সাঁওতালিতে লক্ষণীয়ভাবে বিদ্যমান, যা বাঙলার নিকটতম ভাষা হিন্দিতেও নেই'' (পৃ. ২০)। সাঁওতালিতে lo̲ (burn), o̲l (write), o̲n, o̲ne (there!) [দ্রষ্টব্য P. O. Bodding p. 10], o̲. এর উচ্চারণ বাংলা 'অ' এর মতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''তা হলেই দেখা যাচ্ছে, অকারকে বাংলা বর্ণমালায় স্বীকার করে নিয়ে পদে পদে তাকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে। ... শব্দের শেষে হসন্ত তাকে খেদিয়েছে, শব্দের আরম্ভে সে কেবলই তাড়া খেতে থাকে''। 'শব্দতত্ত্ব'-এ রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা উচ্চারণ' ও 'স্বরবর্ণ অ' প্রবন্ধদ্বয়ে 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং কারণ নির্দেশপূর্বক সূত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। 'বাংলাভাষা-পরিচয়'-এ সেই কথাই ধরা পড়েছে কল্পনাপ্রবণ সৃষ্টিশীল ভঙ্গিতে। 'অ' যদিও ''বাংলা ভাষার বিশেষ সম্পত্তি তবু এ ভাষায় তার অধিকার খুবই সংকীর্ণ''। 'ই' এবং 'উ' ধ্বনির উদ্যমশীলতায় 'অ' ধ্বনির উচ্চারণে বিকৃতি ঘটে, সে 'ও' ধ্বনিতে বদলে যায়। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলা 'অ' ধ্বনির উচ্চারণে তার অধিকারের সংকীর্ণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ ধ্বনির মতো আমরা স্বতন্ত্র 'এ' ধ্বনি ও 'অ্যা' ধ্বনি পাই। রবীন্দ্র-মতে 'অ্যা' ধ্বনি

বিকৃত 'এ' ধ্বনি।" 'এক' কিংবা 'একটা' শব্দের 'এ' গেছে বেঁকে, কিন্তু 'উ' তাকে রক্ষা করেছে 'একুশ' শব্দে"। বাংলাভাষায় 'এ' এবং 'অ্যা' (=) দুইটি পৃথক ধ্বনিমূলীয় সত্তা (phoneme) কিন্তু 'ই' এবং 'উ' ধ্বনির সান্নিধ্যে 'অ্যা' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় যেমন — একটি, একটু। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "স্বরবর্ণের অনুরাগ-বিরাগের সূক্ষ্ম নিয়মভেদ এবং তার স্বৈরাচার কৌতুকজনক"।

রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের উদ্দেশে জানান, "বাংলাভাষাটা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা"। রসনার প্রকৃতিগত আয়াস এবং শ্রমলাঘব করার প্রবণতায় স্থানভেদে এবং কালগতভেদে ভাষার যে চলমান গতির পরিচয় পাই তিনি তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন এবং 'শব্দতত্ত্ব'-এ নানা প্রবন্ধে তিনি তার প্রমাণ রেখে যান। 'বাংলাভাষা-পরিচয়'-এ সেই কথাই ভিন্ন সুরে ভিন্ন মাত্রায় ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষাকে 'ভঙ্গীওয়ালা' বলেছেন নানা প্রসঙ্গে। ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি এ, ও, উ ধ্বনিতে ভাবব্যঞ্জনার অভিব্যক্তির উল্লেখ করেন যখন এই ধ্বনিগুলি বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন কখনো 'স্নেহের' অর্থ, কখনো 'অন্ত্যজ' এবং কখনো 'সম্মানী'র অর্থ পরিস্ফুট হয়। যেমন, 'হরি' যখন 'হরে' অথবা 'কালী' যখন 'কেলো' হয় তখন সম্ভাষণের বদলে অসম্মানের অর্থ, আবার 'উ' ধ্বনি যোগে 'হরু' অথবা 'কালু' হয়ে ওঠে আদরের প্রতীক। রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় সর্বনামের ক্ষেত্রে আমরা 'যত' শব্দের সঙ্গে 'সব' শব্দের জোড়া ব্যবহারে 'তাচ্ছিল্য' বা 'নিন্দার'অর্থ প্রকাশ হতে দেখি। 'যত' শব্দের মধ্যেই আছে 'বিষ'। সেটা এক বিশেষ 'ভঙ্গী' বাংলাভাষায়। 'কেমন' শব্দটাও 'ভঙ্গীওয়ালা' যথা, 'কেমন কেমন', 'কেমন জব্দ', 'কেমন যেন', 'যেন' শব্দটিতে 'বিদ্রূপের ভঙ্গী' লাগানো আছে। 'কেন'-র সঙ্গে 'যে' যোগ করলে 'পরিতাপ' বা 'ভৎর্সনা'র ভঙ্গী যোগ হয়। "কণ্ঠস্বর উৎসাহে দীর্ঘায়ত করলেও বাঁকা ভঙ্গী ধরা পড়ে যেমন, 'ভা—রি পণ্ডিত', 'ম—স্ত নবাব' "ইত্যাদি। আমরা বারে বারে রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনি "চলতি বাংলা ভঙ্গীপ্রধান ভাষা"। 'না' অব্যয় পদের মধ্যে থাকে 'হাঁ'-এর অভিব্যক্তি 'অনুরোধ' অর্থে। ক্রিয়াপদের সঙ্গে শব্দ সংযোজনায় থাকে নানা ভঙ্গী; যেমন, 'করলে-বা', 'হল বুঝি', 'হল তো', 'হোক না', 'করুক গে' ইত্যাদি। বাংলাভাষায় আর এক ধরনের ভঙ্গী দেখা যায় অর্থহীন ধ্বনিসমবায়ে অর্থের প্রকাশ ধ্বন্যাত্মক শব্দ-সৃষ্টিতে। বাংলার মাটি থেকে উঠে আসা শব্দগুলি 'দেশি' শব্দ। রবীন্দ্রনাথ যখন 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত, প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলাভাষা ও প্রাকৃত বাংলা ছন্দের অনুধ্যানে ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মগ্ন, সেই সময় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 'বাংলা শব্দদ্বৈত' ও 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' দুটি প্রবন্ধই তাঁর অনবদ্য সৃজনধর্মী অন্য ধরনের রচনা, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত। এই দুটি প্রবন্ধ আলোচনায় তিনি চলতি বাংলার অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর আগে কেউ এত গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছেন কিনা জানা নেই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'ধ্বনি-বিচার' ১৯০৭ সালে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে ধ্বনি-সংকেতের মাধ্যমে অধরাকে ধরা যায়। "এরা এক আঁচড়ের ছবি"। 'বাংলা শব্দদ্বৈত' ব্যাখ্যায় তিনি লক্ষ করেন শব্দটি দুবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, বহুলতা, প্রগাঢ়তা,অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি নানা ভাব ব্যক্ত করে যা অন্য সম অর্থবহ শব্দ-ব্যবহারে সেই নিগূঢ় অর্থের নির্যাস ব্যক্ত করা যায় না; যেমন, 'মন *কেমন কেমন* করছে', 'আজ সকাল

বাঙ্গালা ভাষা-তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবল কবীন্দ্রই নহেন; বস্তুতঃ তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বে তাঁহার দান উপেক্ষণীয় নহে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করেন। আমরা 'হরি' শব্দের 'হ' এবং 'হর' শব্দের 'হ' একরূপে উচ্চারণ করি না। 'দেখ' এবং 'দেখি' এই দুই পদের 'এ' কার এক নহে। আমরা বলি একটা, দুটো, তিনটে—এক 'টা' শব্দের তিনরূপ—'টা', 'টো', 'টে'। এইরূপ উচ্চারণ বৈচিত্র্যের কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গবেষণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বাঙ্গালা ভাষার স্বর-সাম্যের নিয়ম (Law of Harmonic Sequence or Vocalic Harmony) আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। এইরূপ স্বর-সাম্য কোল এবং কিছু পরিমাণে দ্রাবিড় ভাষায় দেখা যায়। ভারতের বাহিরে উরাল-অল্‌তাই ভাষাগোষ্ঠীতে ইহার প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি নির্ণয়ে আমরা এই স্বর-সাম্যের নিয়ম হইতে কিছু সন্ধান পাই।

রবীন্দ্রনাথ 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ শব্দগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ধ্বনিদ্বৈত, যেমন কল্‌কল্, কট্‌কট্ ইত্যাদি; (২) ধ্বনিদ্বৈধ, যেমন ফুট্‌ফাট্, কূপকাপ ইত্যাদি। তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির গঠন ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়াছেন।

ভাষার যেখানে সাধারণের দৃষ্টি পড়ে না সেখানে তাঁহার গবেষণা তাঁহার আশ্চর্য্য ভাষা-তত্ত্ব-জ্ঞানেরই পরিচায়ক। আমরা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি যে এইরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দ আমাদের প্রতিবেশী অনার্য্য কোল ভাষায়ও বিদ্যমান আছে, যেমন সাঁওতালীতে 'অচেল পচেল', 'আড়ই বাড়ই', 'আগর দিগর', 'অধা পধা', 'আহি বাহি' ইত্যাদি। ইহাতে উভয় ভাষার সংস্রব সূচিত হইতেছে।

বাঙ্গালা বিভক্তির ব্যুৎপত্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে ও পরে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার আলোচনায় নূতনত্ব নাই; কিন্তু কিছু নূতন তত্ত্ব আছে। সম্বন্ধের বহুবচনের দের, দিগের বিভক্তির ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। Beames এবং ভাণ্ডারকর দিগের বিভক্তিকে দিক্ শব্দের ষষ্ঠীর রূপ মনে করেন। Hoernle দের বিভক্তিকে কর্ত্তৃকারকের কল্পিত বহুবচনের দা বিভক্তির সহিত ষষ্ঠীর র যোগে উৎপন্ন মনে করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন আদি, আদিক শব্দ হইতে ইহাদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় দীনেশ বাবুর মতের সমর্থন করিয়াছেন। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের এক মতে সংস্কৃতের ষষ্ঠীর বহুবচনের আনাং বিভক্তি হইতে উৎপন্ন ন বিভক্তির সহিত অপভ্রংশের "সম্বন্ধী" এই অর্থের কের শব্দযোগে দিগের বিভক্তি উৎপন্ন হইয়াছে। আমার নিকট এই মতই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে বাঙ্গালা তাঁহাদের (মূলে তাঁহাদের, তাহান্দের, তাহানের) উড়িয়া তাহাঙ্কর, মধ্য মৈথিলী তাহিঁকরো, প্রাচ্যহিন্দী তিন্‌হকের—এইরূপ পদগুলির মূল অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।